গিরিশচন্দ্র : এক পরম আশ্বাসের নাম

মৃদুলকান্তি ধর

গিরিশ ঘোষের মৃত্যু প্রসঙ্গে শ্রীসারদা দেবী বলেছিলেন : ''...সব তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাঁর কাছে চলে যাবে।... সব তাঁর অঙ্গ, অংশ।''[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার-লীলায়, তাঁর আকর্ষণে নেমে এসেছিলেন 'হোমাপাখি', 'নিত্যসিদ্ধে'র দল। শ্রীভগবানের এই লীলানাট্যে সকলেই তাঁদের নির্দিষ্ট লীলা অভিনয় করেছেন অতি সুষ্ঠুভাবে। তাই জন্মলগ্ন থেকেই যেন ঈশ্বরে অনুরাগ তাঁদের স্বতঃসিদ্ধ। এমন মনে হতে পারে, নতুন জন্মে তাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে অধ্যাত্ম অগ্রগতি কী করে হল? আসলে গুরু-ইষ্টের সঙ্গে তো তাঁদের জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক। চিরন্তন গুরুর অদৃশ্য হাতের কাজ তো চলেছেই। সেজন্য যখন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল, তখনই ক্ষেত্র প্রস্তুত!

মহাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই তিনি বিসূচিকা রোগে মুমূর্ষু হয়ে স্বপ্নে শ্রীসারদা দেবীর দর্শন পেয়েছেন। ফলশ্রুতি আরোগ্যলাভ। ইতিমধ্যে সমাজে নট ও নাট্যকাররূপে তাঁর খ্যাতিলাভ ঘটেছে। কয়েক বছর পর তাঁর রচিত ভক্তিভাবে ভরপুর নাটক 'চৈতন্যলীলা' দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''আসল নকল এক দেখলাম।'' এসব শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-কৃপা পাওয়ার আগেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনের আগেই যদি গিরিশের এই অবস্থা হয়, তাতে একথাই মনে হয় যে ঠাকুর অলক্ষ্যে গিরিশের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছিলেন। গিরিশ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, ''আমার দৃঢ় বিশ্বাস, করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্য সঙ্গে থাকিয়া নিজশক্তি প্রভাবে এ দুর্দান্ত দানবকে আবাল্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।''[২] শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''যাকে লোকে মানে গণে, তার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি আছে।'' গিরিশকে রঙ্গালয়ের প্রায় সবাই শ্রদ্ধা করত, গুরুর মতো মান্য করত। চৈতন্যলীলা নাটক অভিনয়ের প্রস্তুতিপর্বে গিরিশ

অভিনেত্রী বিনোদিনীকে নির্দেশ দেন—তিনি যেন নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন এবং অহরহ শ্রীচৈতন্যের ধ্যানচিন্তা করেন, যাতে দিব্যভাব আনয়নের উপযুক্ত আধার হয়ে উঠতে পারেন। ফলে অভিনয়কালে 'আসল নকল এক হয়ে যাওয়া'-রূপ উৎকর্ষ তিনি লাভ করেন। শুদ্ধ আধারে শ্রীচৈতন্যের ভাবের আবির্ভাব হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবসমাধি অভিনয় করার সময় বিনোদিনী শ্রীচৈতন্যের ভাবে ভাবিত হয়ে স্টেজে পড়ে গিয়েছিলেন; অভিনয় করার দরকার হয়নি। বিনোদিনীও শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলানাট্যে নির্দিষ্ট পাত্রী। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ''তোমার চৈতন্য হোক'' বলে আশীর্বাদ করেছেন; যা দুর্লভ। গিরিশ বলেছেন, ''অনেকে আজীবন তপস্যা করিয়া যে মহাফল লাভে অসমর্থ হন, সেই চতুর্বর্গ ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পাদপদ্ম বিনোদিনী লাভ করিয়াছে।''[৩]

শ্রীভগবানের পার্ষদ যাঁরা, তাঁরা জন্মলগ্ন থেকেই আধ্যাত্মিকভাবে অগ্রসর হন। তবুও প্রত্যেককেই রীতিমতো তপস্যা করতে হয়। গিরিশের ক্ষেত্রে হয়তো বলা যাবে যে তিনি তো বকলমা দিয়েছিলেন। গিরিশের পথ আলাদা, তপস্যাও আলাদা। বকলমা দিয়ে self-denialরূপ সাধন তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সে অন্য সাধনের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। ঈশ্বরই তাঁর জন্য সব করবেন; কিন্তু গিরিশকেও তো নিজেকে শ্রীভগবানের মনের মতো করে গড়ে তুলতে হবে। ''একদিন শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে কোন একটি সামান্য বিষয়ে, 'আমি করিব' বলায় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, 'ও কি গো? অমন করে 'আমি করিব' বল কেন? যদি না করতে পার? বলবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করব।' গিরিশও বুঝিলেন, 'ঠিক কথা, আমি যখন ভগবানের উপর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি এবং তিনিও সেই ভার লইয়াছেন, তখন তিনি যদি ঐ কার্য আমার পক্ষে করা উচিত বা মঙ্গলকর বলিয়া করিতে দেন তবেই তো করিতে পারিব?'—বুঝিয়া তদবধি আমি করিব, যাইব ইত্যাদি বলা ও ভাবগুলো ত্যাগ করিতে লাগিলেন।''

''শ্রীযুত গিরিশ তখন বকল্‌মা বা ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার দেওয়ার এইটুকু অর্থই বুঝিলেন—বুঝিলেন তাঁহাকে নিজে চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়া কোন বিষয় ছাড়িতে হইবে না; ঠাকুরই তাঁহার মন হইতে সকল বিষয় নিজশক্তিবলে ছাড়াইয়া লইবেন। কিন্তু [তিনি] নিয়মের বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্তে যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না।... অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে লাগিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা! আর বাড়িয়া উঠিল—শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া শতগুণে অহংকার। মনে হইল—'সংসারে যে যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি তো সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার—তবে আর কি? কাহাকে ডরাই?'... শ্রীযুত গিরিশ এখন নিশ্চিন্ত এবং খাইতে-শুইতে-বসিতে ওই এক চিন্তা—'শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন'—সর্বদা মনে উদিত থাকিয়া তাঁহাকে যে ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার সকল কর্ম ও মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিলেও সুখী—কারণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে, তাঁহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার!''

''তাঁহার মন কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রতি ব্যাপারে বলিয়া উঠিতে লাগিল—'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ঐরূপ হওয়া তোর পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই ঐ সকল দিয়াছেন। তুই তাঁহার উপর ভার দিয়াছিস

তিনিও লইয়াছেন; কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তিনি তোকে লইয়া যাইবেন, তাহা তো আর তোকে লেখাপড়া করিয়া বলেন নাই? তিনি এই পথই তোর পক্ষে সহজ বুঝিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে তোর 'না' বলিবার বা বিরক্ত হইবার তো কথা নাই। তবে কি তাঁহার উপর বকল্‌মা বা ভার দেওয়াটা একটা মুখের কথামাত্র বলিয়াছিলি?' ইত্যাদি। এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ততই গিরিশের বকল্‌মা দেওয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখনই কি উহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে? শ্রীযুত গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'এখনও ঢের বাকি আছে! বকল্‌মা দেওয়ার ভিতর যে এতটা আছে তখন কি তা বুঝেছি! এখন দেখি যে, সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়েছে তার কাজের আর অন্ত নাই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি করলে!' "[৪]

দাপুটে গিরিশের মধ্যে যে-প্রাবল্য ও পৌরুষ ছিল তা নিয়ে তাঁর পক্ষে এই আত্মবিলয় বা আত্মসমর্পণ যে কত কঠিন ও দুঃসাধ্য ছিল তা সঠিক অনুভব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু কিঞ্চিৎ আন্দাজ করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন গিরিশের মতো একনিষ্ঠ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই তা সাধ্য।

গিরিশের এই বকলমা দান নতুন কিছু নয়, এর অনুরূপ সাধন খ্রিস্টানদের মধ্যেও ছিল। Imitation of Christ-এ পাওয়া যায় :

"The voice of the Lord: My son, you can only enter into my being as you escape from your own. It is when you desire nothing from the world outside that inward peace will be yours; and it is when you give up self in your inmost thoughts that union with God will become a reality.

"It is my will for you to learn complete denial of self, accepting my will without rebellion or complaint."[৫]

"The Lord: give up self, surrender yourself, and you will know great peace in your heart. Give your all for the one who is all; expect nothing, want nothing back; leave yourself with me wholly and without regrets, and you will possess me... to be dead to your own claims, and alive to me for ever."[৬]

গিরিশও সম্পূর্ণ শরণাগত হয়েছিলেন 'আমি'কে নির্মূল করে। তাঁর মধ্যে কখনও rebellion বা complaint দেখা যায়নি। 'ঠাকুর যা করেন', তিনি আমার মঙ্গলের জন্যই এসব করছেন'—এইরকম দৃঢ় প্রত্যয় ছিল তাঁর। এ এক কঠিন সাধনা যার তুলনা পাওয়া কঠিন।

এইভাবে দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্থিব তনু ত্যাগ করলেন। গিরিশের জীবনে চলেছে প্রিয়জনের মৃত্যুর মিছিল। শোক করারও অধিকার নেই। মৃত্যুপথযাত্রী পত্নী ও পুত্রের আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করার অধিকারও নেই। শুধুমাত্র দ্রষ্টা তিনি। কান্নারও অধিকার নেই। কারণ, তিনি বকলমারূপ আত্মদান করেছেন। এ যেন সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জুনকে নিষ্ঠুর সত্য অবলোকন করাচ্ছেন। ঈশ্বরই সত্য, একমাত্র আপনার। আর তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়, যায়, রয়।

আমরা গিরিশের সাধন বা তপস্যার নমুনা একটু দেখলাম। তবু কেউ কেউ বলতেন, অবতারজীবনে দেখা যায় অনেক পাপী ও ব্যভিচারীও ভগবান লাভে সক্ষম হয়েছে। তার উত্তরে স্বামীজী

বলেছিলেন : ''জানবি—তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল, ভোগ করতে করতে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল; হৃদয়ে এত অভাব বোধ হচ্ছিল যে, একটা শান্তি না পেলে তাদের দেহ ছুটে যেত; তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল। তমোগুণের ভেতর দিয়ে ঐ-সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল।''[৭]

পরবর্তী জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যলাভে ধন্য গিরিশ ইহজীবনে আনন্দরসামৃত পানে বিভোর হয়েছিলেন। বলতেন, ''আমি কী ছিলাম, কী হয়েছি!'' শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময়ে বলেছিলেন, ''গিরিশ ঘোষ, তোকে দেখে লোকে অবাক হয়ে যাবে।'' সত্যি, আজও আমরা তাঁকে ভেবে অবাক না হয়ে পারি না।

গিরিশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেছেন। ঠাকুরের স্নেহ-ভালবাসার কথা বলতে গিয়ে তিনি বাক্যহারা হয়ে পড়তেন, তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গিরিশচন্দ্রের গভীর ভালবাসা, তাঁকে ঘিরে আনন্দ-উল্লাস, অতলস্পর্শী বিশ্বাস গিরিশের প্রতিটি কথায় যেন ঝরে পড়ত।

''তদবধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ আমার হৃদয়ে আসিল, গুরুই সর্বস্ব আমার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন-ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, আমার জন্ম সফল।

''ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, এই যে পরম-আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইঁহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণসেবা করিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি—একি আপদ। কিন্তু এ সকল কার্য করিয়াও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় এ সকল আমার সাধন হইয়াছে। গুরুর কৃপায় একটি অমূল্যরত্ন পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া—সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ!''[৮]

''আমার মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত! যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সে ব্যক্তি আমি নাই, হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বর লাভ আমার অনায়াসসাধ্য—এই ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন-যামিনী যায়। শয়নে-স্বপনেও এই ভাব,—পরম সাহস, পরমাত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোন ভয় নাই। মহাভয়—মৃত্যু-ভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।''

''মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে, আমাকে খাওয়াইবার জন্য খাবার লইয়া আসেন। প্রসাদ না হইলে, আমার খাইতে রুচি হইবে না, সেই জন্য মুখে ঠেকাইয়া আমাকে খাইতে দেন। আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা মুখ হইতে খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করি।

''একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাহার ভোজন শেষ হইয়াছে, আমায় বলিলেন,—'পায়েস খাও।' আমি খাইতে বসিয়াছি, তিনি বলিলেন,—'তোমায় খাওয়াইয়া দি।' আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে লাগিলাম। তিনি কোমল হস্তে আমাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। মা যেমন চেঁচেপুঁছে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচেপুঁছে খাওয়াইয়া দিলেন। আমি যে বুড়ো ধাড়ি, তাহা আমার মনে রহিল না। আমি মায়ের বালক, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন,—এই মনে হইল। ...আত্মহারা হইয়া ভাবি, এ ঘটনা কি সত্য হইয়াছিল, না স্বপ্নে দেখিয়াছি! একজন ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি দেব-দৃষ্টিতে আমাকে উলঙ্গ-বালক দেখিয়াছিলেন। সত্যই আমি তাঁহার নিকট গিয়া, যেন নগ্ন-বালকের ন্যায় হইতাম। যে

সকল দ্রব্য আমার রুচিকর, তিনি কিরূপে জানিতেন, তাহা আমি জানি না, সেই সকল দ্রব্য, আমাকে সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইতেন। স্বহস্তে আমাকে জল ঢালিয়া দিতেন। আমি বর্ণনা করিতেছি মাত্র, কিন্তু আমি তাঁর স্নেহ প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি না—জানি না। বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ অনুভব হইতেছে না,—সম্পূর্ণ অনুভব হইলে, যাহা বলিতেছি, বলিতে পারিতাম না, ক্বচিৎ কখনো সে ভাব উদয় হইলে, জড় হইয়া যাই।"[৯]

"পরমহংসদেব আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী—সে অধিকার তাঁহার স্নেহের। এ স্নেহ অতি আশ্চর্য!... তিনি... আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছেন, স্পষ্ট কথায় গ্রহণ করিয়াছেন।"[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-'মুক্ত' অভিমান রাখতে বলতেন, সে-প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র জানিয়েছেন : "তিনি কে তাঁহার সহিত কি সম্বন্ধ বিচার করিলেই, এ মুক্ত অভিমান আপনিই আসে। মৃত্তিকার দেহে যেন আর আত্মা আবদ্ধ থাকে না। চিত্তের মালিন্য দূর হয়। কাম-ক্রোধাদি দুর্দমনীয় রিপু অন্তর্হিত হয়। কোনও সাধন-ভজনের প্রয়োজন থাকে না। কেবল তাঁহার বিমল স্নেহের উপলব্ধিই মুক্তি! উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব! উপলব্ধিই মানব জীবনের চরম অবস্থা! এই অকিঞ্চনের সেই স্থায়ী উপলব্ধি হউক, সকলে আশীর্বাদ করুন।"[১১]

"...যে-ভাগ্যবান গুরুকৃপায় বুঝিয়াছেন যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি দূরে নাই, আমার অন্তরের অন্তরে আছেন, অসহায় বাল্যকালে যে মাতৃস্নেহ পাইয়াছি, সে ঈশ্বরেরই স্নেহ—সাকার মাতৃমূর্তি হইতে আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; তাঁহারই কৃপায় চলিতেছি, বলিতেছি, তাঁহার কৃপায় ডুবিয়া আছি, তিনি কোলে লইতে চান, আমরাই দূরে যাইতেছি; আমার কি মঙ্গল, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে স্থির করিতে পারিতেছি না; তিনি নিয়ত মঙ্গল বিধান করিতেছেন;... তিনি মা'র গুণানুকীর্তন করেন, কেননা, তাঁহার প্রাণ টলিয়া উঠে, না করিলে মহা অশান্তি জন্মে। তাঁহার নিকট অপরাধ নাই, পাপ নাই, তিনি অপার স্নেহময়ী মায়ের সন্তান। তিনি নিজেকে যত ভালবাসেন, তার শতগুণে মা তাঁহাকে ভালবাসেন।। এ মা'র কেন দেখা পাইতেছি না, বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হন।"[১২]

মনে হতে পারে, গিরিশ বকলমা দিয়েছিলেন বলে ধ্যান বা অন্য সাধন কিছুই করেননি। কিন্তু তা ঠিক নয়। তিনি ঠাকুরের শ্রীমূর্তির ধ্যান করতেন; তাঁর লীলা ধ্যান করতেন অর্থাৎ ঠাকুরের প্রকট লীলাসমূহ নিত্য স্মরণ করতেন; তাঁর কথা নিত্য নিরন্তর চিন্তা করতেন; গুরুভাইদের সঙ্গে বিপুল উৎসাহে ঠাকুরের প্রসঙ্গ করতেন। প্রতিটি গুরুভাইয়ের ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনাবলি বারবার শুনেও আশ মিটত না তাঁর। প্রত্যেকেই তাঁদের অভিজ্ঞতা বারবার বলে আনন্দে মগ্ন হতেন। তাঁরা যেন সেইসব আলোচনার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি অনুভব করতেন। সবাই আনন্দে বিভোর হয়ে যেতেন। গিরিশ তাঁর গভীর অনুভূতি থেকে বলেছিলেন—'তব ধ্যান পরম উৎসব।' গিরিশ মাতোয়ারা হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণমনন করতেন। শেষে তিনি উপলব্ধি করলেন—"তাঁহাকে মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়—তাঁহাকে ভুলাই কঠিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরিশের সম্পর্ক অধ্যাত্ম ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা, এক বিচিত্র সংঘটন। গিরিশ চাইতেন অবতারের সঙ্গে হোক মানবিক সম্পর্ক—যেমন পিতা-পুত্র, মাতা-পুত্র। ঈশ্বর—যিনি মানবদেহ ধারণ করে এই মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন—তাঁর সঙ্গে স্বর্গীয় নয়, পার্থিব সম্পর্ক চাই। তাই দোকানের লুচি-আলুর দম চাকরকে দিয়ে আনিয়ে মাটির ভগবানকে নিবেদন করতে তাঁর দ্বিধা নেই। ওবেলা চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁই

শাক হয়েছিল—খেতে তাঁর ভাল লেগেছিল। অগ্রভাগ খাওয়া হয়ে গিয়েছে, তবুও তাঁর ভাল লাগা জিনিস ভগবানকে দিতে সংকোচ নেই। ভাবগ্রাহী জনার্দন নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গিরিশের বড়ই অহংকার। তিনি যে অনুভব করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণই সর্বশক্তিমান পতিতপাবন হরি—তাঁর গুরুরূপে, ইষ্টরূপে আবির্ভূত হয়েছেন! তিনি যে পাপীতাপী, ধনী নির্ধন, বারাঙ্গনা, সাধু—অগণিত জনতার উদ্ধারের জন্য সপার্ষদ অবতীর্ণ হয়েছেন! তাই গিরিশ আকুলভাবে চাইতেন এ-সংসারের মলিনতা মাখা মানুষ ছুটে আসুক তাঁর কাছে পরিত্রাণ পেতে, মনুষ্যজন্ম সার্থক করতে।

গিরিশ মনে প্রাণে চাইতেন সংসারে বদ্ধ মানুষদের শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণপ্রান্তে এনে ফেলতে, যাতে তারা মনুষ্যত্ব লাভ করে, ঈশ্বরকে লাভ করে ধন্য হয়। নিজ জীবনে ভগবান লাভ করে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে ভগবান লাভ অসম্ভব নয়। সেজন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে বলতেন : তোমরা ঈশ্বরের শরণাগত হও, পতিতপাবন ভগবান তাহলেই কৃপা করবেন। গিরিশের নিজের ভাষায় : ''সেই (মুক্ত) অবস্থা পাইবার (জন্য) ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাই একমাত্র পন্থা। হয়তো তিনি ভাবেন, আমার মন অতি দুর্বল, এরূপ প্রার্থনা করিতেও পারি না। এই দুর্বলের নিমিত্ত কৃপাময় রামকৃষ্ণদেব কি সহজ উপায়ই করিয়াছেন! তোমার এই মনের দুর্বলতা অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট জানাও, যতটুকু পারো জানাও, তিনি বিন্দুকে সিন্ধু করিয়া তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তুমি দুর্বল—তিনি জানেন। তুমি একবার শরণাগত হইলে, তিনি শরণাগতকে পরিত্যাগ করিবেন না—তিনি শরণাগত দীনের পরিত্রাণপরায়ণ। এই রামকৃষ্ণের মহাবাক্য।—কেহ এরূপ দীন নয়, কেহ এরূপ সাংসারিক হীন অবস্থাগত নয় যে, দিনান্তে একবার এইরূপে তাঁহার মনের অবস্থা ঈশ্বরকে জানাইতে না পারে।...

''... যদি কেহ আমাদের ন্যায় হীন, আমাদের ন্যায় দুর্বলচিত্ত থাকেন, তাঁহার চরণে আমার সবিনয় নিবেদন, একবার এই মহাবাক্য হৃদয়ে স্থান দেন, এই মহাবাক্যের প্রভাব দিন-দিন উপলব্ধি করিবেন। নিরাশ হৃদয়ে আশা আসিয়া বসিবে, বলবান্ আশা—কোনরূপ সংসার-তাড়নায় তাহা টলিবে না। যাহা বলিতেছি, যদি না উপলব্ধি করিতাম, এরূপ দৃঢ়বাক্যে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম। একবার সেই ধ্রুবতারার প্রতি যাঁহার দৃষ্টি পড়িবে, তিনিও ক্রমে এইরূপ দৃঢ়বাক্যে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের অতুল প্রভাব প্রকাশ করিবেন, ও হৃদয়-উচ্ছ্বাসে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া করতালি দিবেন।''[১৩]

গিরিশের উপস্থিতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ববোধ উৎপন্ন হত। অবিশ্বাসীর প্রাণেও বিশ্বাসের সুবাতাস বইতে শুরু করত। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যে গিরিশের উপস্থিতি অধ্যাত্মজগতে এক পরম আশ্বাসের বাণী বহন করে। যারা নিজেকে দুর্বল, পাপী এবং বদ্ধ বলে মনে করে, তাদের ক্ষেত্রে গিরিশ আশ্বাসের-বিশ্বাসের এক বলিষ্ঠ হুঙ্কার। তিনি বলতে চান ঈশ্বর মাটির ধরায় অবতীর্ণ—দয়ায় আত্মহারা। এই তো মানুষের পক্ষে সুবর্ণসুযোগ ভগবানের দয়া লাভ করার।

গিরিশের ধারণা ঠাকুর যে রঙ্গালয়ে নাটক দেখতে আসতেন তা শুধু নাটক দেখার জন্য নয়; তিনি পতিত উদ্ধার করতেই আসতেন—অভিনয় দেখাটা একটা ভানমাত্র। গিরিশও রঙ্গালয়ের কর্মী, নটনটীদের মধ্যে যে-কেউ ঠাকুরের প্রতি আগ্রহী বুঝতেন, তাকেই ধরে সুযোগ বুঝে ঠাকুরের কাছে এনে তাঁর শ্রীচরণে উৎসর্গ করতেন। মনে মনে আকুল প্রাণে চাইতেন তাদের কল্যাণ। পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের উদ্ধার করুন—সেই সংকল্প তাঁর

হৃদয়ে থাকত এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে তারা উদ্ধার হল। আরও বিশ্বাস করতেন—ঠাকুর তাদের উদ্ধার করার জন্যই গিরিশকে রঙ্গালয়ে রেখেছেন।

''আর গিরিশের কি বিশ্বাস! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন, 'প্রভু তুমিই ঈশ্বর—মানুষদেহ ধারণ করে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য।' গিরিশ ঠিক তো বলেছেন, ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না করলে ঘরের লোকের মতো কে শিক্ষা দেবে, কে জানিয়ে দেবে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, কে ধরায় পতিত দুর্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে? কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশব-স্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ববৎ অমৃতের অধিকারী করবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে যাঁরা তদ্‌গতান্তরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না তাঁরা কি করে কাটাবেন?''[১৪]

গিরিশ বলতেন, তিনি নিজে নিজেকে যতটা ভালবাসেন, ঠাকুর তাঁকে তার শতগুণ ভালবাসেন। এ-অনুভব আমাদের ঠিক ঠিক হওয়া কঠিন। তবু 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র একটি দৃশ্য থেকে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের ভালবাসায় বিগলিত রূপটি কেমন হয় তা বোঝা যায় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গিরিশের প্রতি ঠাকুরের ব্যবহার দেখে। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের জন্য ফাগুর দোকানের কচুরি আনিয়েছেন, নিজে প্রসাদ করে দিয়ে স্বহস্তে তা তাঁকে দিয়েছেন, দাঁড়াবার শক্তি না থাকায় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিয়েছেন। আবার গ্লাসের জল হাতে নিয়ে পরীক্ষা করেছেন ঠান্ডা কি না।[১৫]

এই অপার্থিব ভালবাসার আরও স্বীকৃতি গিরিশের কণ্ঠে : ''আমি ঘৃণিত বারাঙ্গনার গৃহ হইতে তাঁহার নিকট গিয়াছি, আমাকে বসিতে আসন দিয়াছেন। আমার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে পাপ থিয়েটার-গৃহে মিঠাই লইয়া আসিয়াছেন। আমি এ ভালবাসা কোথাও পাই নাই। আমার নিকট তিনিই ভগবান, তিনিই অবতার।''[১৬]

ঈশ্বর মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন, মাটির মানুষকে ভালবাসতে, তাদের দয়া করতে, উদ্ধার করতে—এই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান হয়ে গিরিশ ভাবতেন, ''তিনি আমার সর্বস্ব, তবে কেন মাটির মানুষের কামনা বাসনা পূরণ করবেন না?'' তাঁর ত্যাগী সন্তানেরা কামনা পূরণের জন্য ঠাকুরকে ধরা নিন্দনীয় বিবেচনা করতেন। তাই গিরিশ বলতেন, ''যাঁহাকে ভগবান বলিয়া স্থির জানিয়াছি, তাঁহার কাছে কেবল ধর্মের জন্যই যদি প্রার্থনা করিব, তবে আমার জন্য সকল কামনা কি শয়তান পূরণ করিবে?''

''গিরিশ স্তম্ভিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা পুষ্টির জন্যই তবে আমার পূর্ব জীবনে দুষ্কৃতানুষ্ঠান, আমিও তো শ্রীভগবানের লীলাসহচর। হে ভগবান! তোমার সহিত তবে আমার নিত্যসম্বন্ধ। তবে অনন্তগুণে দুষ্কৃতকারী বলিয়া পরিচিত হইতে হইলেও আমার কষ্ট নাই। হে কৃপাসিন্ধু—তোমার চিরদাসকে তুমি যে সাজে যতবার ইচ্ছা সংসারে আনিতে চাহ—আনিও; তোমার চিরপদাশ্রিত—এই জ্ঞানটুকু কেবল আমায় ভুলাইয়া দিও না।''[১৭]

গিরিশের বলিষ্ঠ গভীর বিশ্বাস ও বিপুল অনুরাগ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে ঠাকুর ও মায়ের স্বরূপ প্রথম উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিল। শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীশ্রীকালীপূজার রাতে পুষ্পচন্দন নিয়ে সবার আগে 'জয় মা' বলে ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সমস্ত শরীর শিহরিত হয়। তিনি গভীর সমাধিস্থ হন; তাঁর মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় ও দিব্য হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, হস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা ধারণ করে। ঠাকুরের দেহে দেবীর আবির্ভাব অনুভব করে উপস্থিত ভক্তদের প্রাণ আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। ঠাকুর ও

মা কালীর অভেদত্ব প্রথম উদ্ঘাটিত হল গিরিশের বিশ্বাসের বলেই।

সংসারে যে যেখানে যে-অবস্থায় আছে তার সংস্কার ও কর্মফল প্রভাবে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে সেখান থেকেই উদ্ধার করবেন যদি সে আন্তরিক শরণাগত হয়—গিরিশ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে একথাই বলেছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস নিয়ে শ্রীভগবানকে নিজের হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করে চিরকালের মতো হয়ে উঠেছেন এক পরম আশ্বাসের নাম। ✠

তথ্যসূত্র

১। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০৫), অখণ্ড, পৃঃ ২০৮

২। শ্রীশচন্দ্র মতিলাল, *ভক্ত গিরিশচন্দ্র* (দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, ১৪০৯), পৃঃ ৮৬

৩। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও বিবেকানন্দ* (জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং : কলকাতা, ২০১৩), পৃঃ ১৪০ [এরপর, *শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও বিবেকানন্দ*]

৪। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০০), ভাগ ১, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪-৫

৫। Thomas A. Kempis, *The Imitation of Christ* (1974), p. 203

৬। Ibid, p. 169

৭। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ৯, পৃঃ ৯৪

৮। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও বিবেকানন্দ, পৃঃ ৩৬

৯। তদেব, পৃঃ ৮৩

১০। তদেব, পৃঃ ৮৫

১১। তদেব, পৃঃ ৮৬

১২। তদেব, পৃঃ ৪০

১৩। তদেব, পৃঃ ৪০-৪১

১৪। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১) পৃঃ ৭৮৩

১৫। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১০৩৯

১৬। *শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও বিবেকানন্দ*,, পৃঃ ১৭২

১৭। তদেব, পৃঃ ১৯২

বিজ্ঞপ্তি

প্রতিটি সংখ্যা পৃথকভাবে নিতে হলে এক বছরের নবীকরণের টাকার সঙ্গে (১৩০+১২০) ২৫০ টাকা এবং তিন বছরের হলে (৩৮০+৩৬০) ৭৪০ টাকা পাঠাতে হবে।

বছরে তিনবার দুটি করে সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে হলে এক বছরের জন্য (১৩০+৮০) ২১০ টাকা এবং তিন বছরের জন্য (৩৮০+২৪০) ৬২০ টাকা পাঠাতে হবে।

এইভাবে যাঁরা নেবেন তাঁদের আর পূজাসংখ্যার জন্য আলাদা রেজিস্ট্রি চেক দিতে হবে না।

শুধুমাত্র পূজাসংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়ার জন্য ৪০ টাকা পাঠাতে হবে।